কোরবানি

মীজান রহমান

বহুদিন প্রবাসে থাকার কারণে কিনা জানি না, আজকাল কোরবানির ঈদ কাছিয়ে এলেই বুকটা কেমন কাঁপতে থাকে। মনটা ভারী হয়ে আসে। নিজে কোরবানি দিতে পারব না সে-দুঃখে নয়, কোরবানির কারণে এতগুলি সুস্থ সবল জীবন্ত প্রাণীকে অনর্থক প্রাণ হারাতে হবে সেই দুঃখে।... ... দুঃস্থ মানবতার সেবাই কি ঈশ্বরের সেবা নয় ? জীবের রক্তের চেয়ে জীবের কল্যাণই কি তাঁর বেশি কাম্য নয় ? আমার বিশ্বাস, এই সামগ্রিক কল্যাণের মাঝেই নিহিত আমাদের নির্বাণ।

ঈদের সময় এলে আমার খুব ছোটবেলার কথা মনে পড়ে। রোজার ঈদের সবচেয়ে বড় উত্তেজনা ছিল চাঁদ দেখা। চাঁদ দেখা না গেলে কি যে খারাপ লাগত মনটা সেকথা এখনো ভুলিনি। নতুন কাপড় পরব, গায়ে আতর লাগাব, সুরমা লাগাব, লোকের বাড়ি বাড়ি গিয়ে নানারকম সেমাই জর্দা খাব। কোরবানির ঈদের বড় আকর্ষণ ছিল মৌলভীসাহেবদের গর" আর ছাগল জবাই দেখা। জন্তুগুলো যত ছটফট করত ততই যেন ফূর্তি লাগত আমাদের। নিজেদের বাড়িতে কোরবানি হলে তো কথাই নেই। যে-বছর বাবার সামর্থ্য হত না ছাগল কেনার, সে-বছর অন্যের বাড়িতে গিয়ে কোরবানি দেখতাম। তারপর সারাদিনভর নানা জায়গা থেকে থালাবোঝাই মাংস আসত আমাদের বাসায়। সে মাংস আমরা একমাস ধরে মজা করে খেতাম। নিজেদের কোরবানি হলে আরো মজা করে খেতাম। জন্তুটার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কোনটাই ফেলনা যেত না। গিলা, কলিজা, মগজ, কড়কড়া হাড়, দাঁড়া, চোখ, এমনকি পাকস্থলীটা পর্যন্ত মহাতৃপ্তির সাথে ভণ করতাম। খাওয়ার পর চর্বিতে হাতের পাঁচটা আঙ্গুল চুবচুব করত। সেগুলোকে তখন মুখের ভেতর ঢুকিয়ে চর্বি চুষতাম। টেলিভিশনের ডিসকভারি চ্যানেলে ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক প্রোগ্রামে মাঝে মাঝে বাঘ সিংহ আর হায়েনাদের ভোজনপর্ব দেখানো হয়, হতভাগ্য কোন হরিণ, জেব্রা বা মহিষের ওপর। আমাদের কোরবানির মাংস খাওয়ার দৃশ্য নিশ্চয়ই তার চাইতে খুব একটা পৃথক নয়। পার্থক্য শুধু এইটুকু যে আমরা তেলনুন মরিচমশলা মিশিয়ে জিনিসটাকে আরো উপাদেয় করি, ওরা তা পারে না।

বহুদিন প্রবাসে থাকার কারণে কিনা জানি না, আজকাল কোরবানির ঈদ কাছিয়ে এলেই বুকটা কেমন কাঁপতে থাকে। মনটা ভারী হয়ে আসে। নিজে কোরবানি দিতে পারব না সে-দুঃখে নয়, কোরবানির কারণে এতগুলি সুস্থ সবল জীবন্ত প্রাণীকে অনর্থক প্রাণ হারাতে হবে সেই দুঃখে। তাতে যেন কেউ ভুল সিদ্ধান্তে পৌঁছে না যান যে কোরবানির ওপর থেকে আমার আস্থা উঠে গেছে। বরঞ্চ আমি দাবি করব যে কোরবানির মুল আদর্শের প্রতি আমার মৌলিক ভক্তি আগের চাইতে হাজারগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে দুটি ঈদের মাধ্যমে আমাদের ধর্ম দুটি অমুল্য জিনিস শিখিয়েছে। শিখিয়েছে যে সংযম আর ত্যাগ দুটোই মুলত উৎসবের জিনিস, কষ্টের জিনিস নয়। রোজার ঈদে আমরা সংযমের উৎসব করি, কোরবানির ঈদে করি ত্যাগের। যত অন্তর্লীন সেই সংযম আর যত ব্যক্তিগত সেই কোরবানি ততই তার তৃপ্তি। একে কেউ বলে সোয়াব, কেউ বলে পুণ্য। আমার কাছে এটাই মনুষ্যত্ব। তবে ছোটবেলায় যেটা বুঝিনি এবং যেটা বুঝতে আমার অনেক সময় লেগেছে সেটা হল যে এই পুণ্যের একটি পুর্বশর্ত আছে। শর্তটি এই যে সংযম আর ত্যাগ কোনটাকেই 'আত্ম' শব্দটা থেকে আলাদা করা যাবে না। অর্থাৎ এটা আত্মসংযম, আত্মত্যাগ। ফাঁকি দেওয়া সংযম আর পয়সা দিয়ে কেনা ত্যাগ হলে

চলবে না। সারাদিন রোজা রেখে নামাজ পড়ে অনর্গল মিথ্যা কথা বলা আর ঘুষ খাওয়ার নাম আত্মসংযম নয়, আত্মপ্রতারণা। অসদুপায়ে অর্জিত টাকার জোরে গর" কোরবানি দেওয়ার নামও আত্মত্যাগ বলে আমি মনে করি না, নিতান্ই গোহত্যা। এমনকি সদুপায়ে অর্জিত টাকার কোরবানিকেও আত্মত্যাগ বলা যায় কিনা সে-বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। যে কর্মের জন্য অন্য প্রাণীকে প্রাণ হারাতে হয় সেটাকে কোরবানি বলি কোন্ যুক্তিতে।

পশ্চিম জগতে আজকাল অনেকেই প্রাণীহত্যা ও প্রাণীনির্যাতনের বির"দ্ধে সংঘবদ্ধ আন্দোলন শুর" করে দিয়েছে। তারা তুন্দ্রা অঞ্চলের শীলহত্যা বন্ধ করবে, সমুদ্রের তিমিহত্যা বন্ধ করবে, গবেষণাগারে ইঁদুর-বানর আর শশকের ব্যবহার বন্ধ করবে, এমনকি চিড়িয়াখানা থেকেও সব বনের পশুর খাঁচা খুলে দেবে। জীবজগতের জন্য তাদের অশেষ মায়া তাতে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু তাদের আপোষহীন উগ্র পদ্ধতিগুলো মাঝে মাঝে আমাকে খানিক বিচলিত করে। তুন্দ্রা অঞ্চলের অনেক আদিম সম্প্রদায় আছে যাদের জীবিকা নির্ভর করে প্রাণীহত্যার ওপর। ঐ হত্যাকে আমি আমোদের হত্যা বা মুনাফার হত্যা বলে গণ্য করি না। ওটা প্রয়োজনের হত্যা। বনের এক পশু যেমন আরেক পশুকে হত্যা করে জীবনধারণ করে আদিবাসীদের প্রাণীহত্যা অনেকটা সেরকম। তাদের কাছ থেকে সেই অধিকারটুকু কেড়ে নেবার পক্ষপাতী আমি নই। কিন্তু যে হত্যা আমাদের তথাকথিত সভ্য সমাজের বিলাসকামনা চরিতার্থ করে সে হত্যাকে আমি সমর্থন করি না। যে হত্যা অনায়াসে পরিহার্য, যে হত্যা মানুষের জীবনমৃত্যুর মৌলিক সংগ্রামের সঙ্গে সম্স্লৃক্ত নয় সে হত্যাকে আমি সভ্যতার পরিপন্থী বলেই গণ্য করি। বিশেষভাবে পরিপন্থী মনে করি ঐসব হত্যাকে যা দিয়ে মানুষ তার কল্পিত ঈশ্বরকে তুষ্ট করার প্রয়াস পায়। এককালে মানুষ তার অজ্ঞতা, অন্ধতা আর অজানার ভয়কে আড়াল করার জন্য পশুবলি তো বটেই, নরবলি দিতেও দ্বিধা করত না। যৌবনে আমি বনফুলের একটা মোটা উপন্যাস পড়েছিলাম। বইটির নাম এখন আর মনে নেই। কিন্তু মুল কাহিনীটা মনে আছে এখনো, কারণ ওটা মনে হলে এখনো আমার গায়ের লোম খাড়া হয়ে ওঠে। কালীভক্ত দস্যুদের একটা দল ছিল যারা নির্জন রাস্া থেকে অসহায় পথিককে ধরে নিয়ে যেত আর মা-কালীর মুর্তির সামনে নানারকম পুজা অর্চনার পর জ্যান্ বলি দিত, যেমন করে আজকাল লোকে পাঁঠা বলি দেয় এককোপে মুণ্ড"ছেদ করে। আমি শিউরে উঠেছিলাম 'টাইম' পত্রিকায় প্রকাশিত সেই কিশোর মেয়েটির আশ্চর্যরকম জীবন্ ছবি দেখে -মায়াসভ্যতার চরম গৌরবের কালে তাকে বলি দেওয়া হয়েছিল কোন এক শক্তিশালী ভগবানের কাছে। আমি চমকে উঠতাম মেক্সিকোর অ্যাজটেক জাতির ইতিহাস পড়ে। তারা ছিল যোদ্ধার জাতি। আশেপাশের দুর্বল জাতিগুলোর ওপর তারা নিয়মিত হামলা চালাত প্রধানত একটি কারণে - কয়েদী এনে ঘটা করে তাদের ভগবানের কাছে অর্পণ করা। তাদের অর্পণের পদ্ধতিটা ছিল বিশেষভাবে অমানুষিক। জ্যান্ মানুষটির বুক কেটে তাজা হৃদপিণ্ডটা উপড়ে আনা হত। তাদের সুর্যদেব আর সমরদেবকে তুষ্ট করার আশায়। ভগবান যে রক্ত ছাড়া তুষ্ট হন না এই বিশ্বাস আমাদের ভেঙ্গে যাওয়া উচিত ছিল অনেক আগেই। ভগবান তো শুধু ঐ কারণেই যুগে যুগে এতগুলো দুত পাঠালেন আমাদের কাছে। পরিষ্কার বলে দিলেন যে তিনি রক্ত চান না, তিনি চান ভক্তি। কিন্তু দুর্বল মানুষের সেই প্রাচীন রক্তের মোহ এখনো পুরোপুরি ভাঙ্গেনি। এখনো আমরা বিশ্বাস করি যে তাজা রক্ত না পেলে বিধাতা খুশি হন না। ব্রিটিশ কলাম্বিয়াতে আমার এক বাংলাদেশী বন্ধু থাকেন যাঁকে আমি গভীরভাবে শ্রদ্ধা করি। তাঁর মত অমায়িক, সহৃদয় ও সাত্বিক পুর"ষ আমি খুব কম দেখেছি। একসময় তিনি অটোয়াতেই থাকতেন সপরিবারে। তখন বেশ যাওয়াআসা হত আমাদের মাঝে। আমাদের পরিচয় আসলে তখন থেকেই। আজ থেকে প্রায় বাইশ বছর আগের কথা বলছি। পেশায় অ্যাকাউন্টেন্ট, নেশায় গ্রন্থকীট। জানতেন অনেক, বলতেন কম। পার্টিতে গিয়ে এককোণায় বসে লোকের কথা শুনতেন, নিজে তেমন মন্ব্য করতেন না। খাওয়ার সময় পেটের ওপর খানিকটা সাদা ভাত আর সবজি নিয়ে চুপচাপ খেয়ে উঠতেন।

গোমাংস, মুরগী বা মাছ কোনটাই স্পর্শ করতেন না। কৌতূহলী হয়ে একদিন জিজ্ঞেস করলাম উনি সারাজীবনই নিরামিষাশী ছিলেন কিনা। বললেন, না। যৌবনের একটা সময় পর্যন্ত মাংস খেতেন, তারপর ছেড়ে দিয়েছেন। ব্যাখ্যা করে বললেন না কেন। আমিও আর কিছু জিজ্ঞেস করিনি। তারপর ইদানিং আমার একটা লেখা পড়ে তিনি নিজে থেকেই বলে ফেললেন তাঁর মাংস ছাড়ার মুল কারণটা। একবার তাঁর চোখের সামনে একটা গরু কোরবানি হল। জবাইয়ের ঠিক আগের মুহূর্তে তিনি গরুটার দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে ছিলেন। দেখলেন বেচারীর চোখ দিয়ে পানি পড়ছে। অন্তত তাই মনে হয়েছিল তাঁর। অর্থাৎ তাঁর মনে হল গরুটা কাঁদছে। চিৎকার করে বলতে পারছে না 'আমাকে মেরো না, আমাকে মেরো না', কারণ সৃষ্টিকর্তা তাকে সে শক্তি দেননি। কিন্তু কাঁদার শক্তি ছিল তার। মিনতি করার মত চাহনি ছিল তার। ঐ চাহনি আর কেউ দেখেনি, দেখতে চায়নি। দেখলেও কেউ ভ্রূক্ষেপ করত কিনা সন্দেহ। কিন্তু আমার বন্ধুটি দেখেছিলেন। মনে মনে তিনিও কেঁদেছিলেন। তারপর থেকে কোনদিন তিনি মাংস স্পর্শ করেননি। প্রশড়ব হল তাহলে কি প্রাণীদের বোধশক্তি আছে ? তারা কি মৃত্যুর ব্যথা বুঝতে পারে ? বুঝতে পারে কণ্ঠনালীতে ছুরির আঘাত ? আধুনিক বিজ্ঞান বলছে, পারে, খুব ভাল করেই পারে। এই তো সেদিন এক নিবন্ধে পড়লাম ছিপের বড়শিতে আটকে গেলে মাছের কি তীব্র যন্ণা হয়। শিকারীর গুলি খেয়ে পাখিরা আর হরিণেরা কত ছটফট করে। আরেক নিবন্ধে পড়েছিলাম জ্যান্ শীলের গা থেকে কেমন করে সভ্য মানুষ চামড়া খুলে নেয় নিখুঁত ফারের কোট বানানোর জন্য। এমনকি আমাদের দেশেও মাঝে মাঝে শোনা যায় জ্যান্ গরুর চামড়া ছিঁড়ে নেওয়ার লোমহর্ষক কাহিনী। ক্যানাডা-আমেরিকার গলদা চিংড়ীগুলোকে যখন জীবন্ অবস্থায় গরম পানিতে ডুবিয়ে মারা হয়, তখন তারাও কষ্ট পায়। তারা সবাই কষ্ট পায়, অবর্ণনীয় কষ্ট পায়। তারা কাঁদে, তারা ডুকরে ডুকরে কাঁদে। কিন্তু তাদের কানড়বা আমরা শুনি না, তাদের কষ্ট আমরা বুঝি না, তাদের যন্ণা আমাদের পাষাণ মনে দয়ার সঞ্চার করে না।

আমার এক গ্রাম-সম্পর্কের চাচার গোয়ালে একটি লক্ষ্মী গরু ছিল। আসলে গরুটার নামই রাখা হয়েছিল লক্ষ্মী। পাশের গ্রামের এক হিন্দু পরিবার জমিজমা বিষয়সম্পত্তি সব জলের দামে বিক্রী করে ইণ্ডিয়াতে চলে গিয়েছিলেন। গরুটাকে চাচা ওঁদের কাছ থেকেই কিনে নিয়েছিলেন। স্বপেড়বও ভাবেননি যে এই গরুর কল্যাণে তাঁর সমস্ ভাগ্যটাই খুলে যাবে। বছরখানেকের মাঝেই লক্ষ্মীর একটি বাছুর হল। তখন থেকে সে এত দুধ দিতে শুরু করল যে সেই দুধ বিক্রী করে চাচা কূল পেতেন না। সাধারণ গাইগরুর কয়েকগুণ বেশি দুধ দিত সে। এভাবে কয়েকবছর কাটার পর চাচার নতুন শনের ঘর উঠল। মেয়ে বিয়ে দিলেন বেশ ঘটা করে, ছেলেকে শহরে পাঠালেন কলেজে পড়ার জন্যে। তারপর আস্তে আস্তে গরুটা বুড়িয়ে যেতে লাগল। দুধের বোঁটাগুলো চুপসে যেতে শুরু করল। চাচা তখন তার ঘাড়ে লাঙ্গল চাপিয়ে ক্ষেতের কাজে লাগিয়ে দিলেন। দুতিনবছর লক্ষ্মী ক্ষেতের কাজ করল, বিশ্বস্ পশুরা যেমন করে মুনিবের আজ্ঞা পালন করে। একদিন লাঙ্গল বইতে গিয়ে সে আর পেরে উঠল না। মুখ দিয়ে সাদা ফেনা বেরুতে লাগল। যেন পা ভেঙ্গে পড়ে যাবে। চাচা ভাবলেন সর্বনাশ। একে দিয়ে তো আর কোন কাজ করানো যাবে না। ভাগ্যক্রমে তখনই এসে গেল কোরবানির ঈদ। চাচা মনে মনে মাংসের গন্ধ পেতে লাগলেন। বুড়ি লক্ষ্মীকে ওরা ধরে শোয়ালো। তারপর জোরে জোরে দু'ছত্র আলার নাম করে মৌলভীসাহেব তার গলায় ছুরি বসিয়ে দিলেন। কোরবানি হয়ে গেল। পুরো মাস ধরে লক্ষ্মীর গায়ের মাংস খেল তারা। লক্ষ্মীর মগজটাকে ভালভাবে রানড়বা করে তারা মেয়ের শ্বশুরবাড়িতে পাঠিয়ে দিল। লক্ষ্মীর গায়ের চামড়া বিক্রী করে আরো কিছু নগদ টাকা এল চাচার হাতে। লক্ষ্মীর শিং দুটোও নাকি চাচা বিক্রী করতে পেরেছিলেন। তাহলে চাচা কোরবানি দিলেন কি ? কোরবানি যা দেবার সব তো লক্ষ্মীই দিয়ে গেল। শুধু কি পুণ্যটাই থাকবে চাচার খাতায় ?

আসলে কোরবানি জিনিসটাকে আমি কোন বাহ্যিক ক্রিয়া বলে মনে করি না। আমার মতে এটা একান্ই একটি আভ্যন্রীণ ঘটনা। মানসিক বললেও ভুল হবে না। মধ্যযুগে মানসিক ত্যাগের ধারণা মানুষের কাছে পরিষ্কার ছিল না, তাই কোরবানি বলতে আমরা বুঝতাম একটা চতুষ্পদী হালাল জন্তুকে রীতিমাফিক বলি দেওয়া। সেযুগে মানুষের জ্ঞান ছিল অত্যন্ সীমিত, চিন্া ছিল আরো সীমিত। কোন কোন দেশে তখনও ঈশ্বরের নামে নরবলির প্রচলন সম্পূর্ণ দুর হয়ে যায়নি। সেযুগের তুলনায় আজকের যুগ অনেক অগ্রসর। আজকে আমরা শুধু নিজেদের অভ্যন্র সম্বন্ধেই যে অনেক সচেতন হয়ে পড়েছি তাই নয়, গ্রহান্রের অনেক রহস্যও আমাদের কাছে এখন উদ্ঘাটিত হয়ে গেছে। আগের অজ্ঞতা এখন নেই আমাদের। সুতরাং আগের অন্ধতাও থাকা উচিত নয়। আগের আচার-আচরণ থেকে কিছু কিছু অনাবশ্যক ও অমানুষিক আনুষ্ঠানিকতা বর্জন করতে পারলে মহান বিধাতা র'ষ্ট হওয়ার চেয়ে তুষ্টই বেশি হবেন বলে আমার বিশ্বাস। পশ্চিমে এতদিন থাকার পরও পশ্চিমের বিলাসজীবনের প্রতি আমার সামান্যতম দুর্বলতা সৃষ্টি হয়নি। আমি নিজে কোনদিন লটারির টিকেট কিনিনি, লটারির মৌলিক নীতির ওপর আমার কোন আস্থা নেই। যারা লটারিতে জিতে কোটিপতি হয়ে যায় তাদের প্রতি আমার হিংসা হয় না, মায়া হয়। তবে আমার ভীষণরকম হিংসা হয় যখন টেলিভিশনে দেখি শ্বেতাঙ্গ স্বে'ছাসেবকরা নিজেদের সমস্ সুখশান্তি বিসর্জন দিয়ে তৃতীয় বিশ্বের কোন দুর্গত এলাকার আশ্রয়শিবিরে গিয়ে আর্ত র"গড়ব কাতর মানুষকে সেবা করছে। আমার বড় হিংসা হয় যখন দেখি 'ডক্টর্স্ উইদাউট বর্ডার্স'-এর মহৎপ্রাণ তর"ণ চিকিৎসকরা পৃথিবীর নানা বিপজ্জনক জায়গায় গিয়ে নিজেদের নিরাপত্তার কথা গ্রাহ্য না করে আহত মানুষের সেবায় আত্মনিয়োগ করছে। সেখানে আমি দেখি শুধু শ্বেতাঙ্গের মুখ। সেখানে আমি কোনদিন একটি দীর্ঘ শ্মশ্র"মণ্ডিত নুরানি চেহারার মুখ দেখিনি। এই যে এত সহস্র নির্দোষ মানুষ প্রাণ হারালো বজনিয়ায়, কসোভোতে আর রোয়াণ্ডাতে, এত লাখো নারী হারালো মানসম্ভ্রম, এত শিশু আর এত কিশোরকিশোরী হারালো হাত পা চোখ কান, হারালো বাবামা, এই যে এত অসহায় মানুষ প্রতিদিন ধুকে ধুকে মরছে সুদানের শ্মশানে, সেখানেও আমি আমাদের চেহারার স্বে'ছাসেবক দেখিনি একটিও। কেবল দেখি শ্বেতাঙ্গের মুখ। ওটাকে আমি হিংসা করি। একটা মাস বা একটা সপ্তাহ যদি নিজের আরামের জীবনটাকে সাময়িকভাবে অগ্রাহ্য করে পৃথিবীর কোন দুর্গত এলাকায় গিয়ে ক'টা দুঃস্থ মানুষকে খানিক স্বস্তি, খানিক আশা দিয়ে আসা যায় সেটা কি একমাস ধরে গর"র মাংস খাওয়ার চেয়ে বড় কোরবানি বলে গণ্য হওয়া উচিত নয় ? দুঃস্থ মানবতার সেবাই কি ঈশ্বরের সেবা নয় ? জীবের রক্তের চেয়ে জীবের কল্যাণই কি তাঁর বেশি কাম্য নয় ? আমার বিশ্বাস, এই সামগ্রিক কল্যাণের মাঝেই নিহিত আমাদের নির্বাণ। কল্যাণসাধনের ভেতরে যে ত্যাগের আদর্শ ওটারই আরেক নাম হওয়া উচিৎ কোরবানি।

ডঃ মীজান রহমান, গনিতের অধ্যাপক; অটোয়া প্রবাসী লেখক।